দেশের শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ ও করণীয়

হাতির পিঠে চিমটি মারার বদভ্যাসই বলুন আর দুঃসাহসই বলুন, তা আমার কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেলে ছোটখাটো একটা চিমটি না মেরে গত্যন্তর থাকে না। পত্রিকা পড়লেই দেখি, এমন চিমটি আমার মতো অসংখ্য অভাজন প্রতিনিয়তই মারছেন। লাভের লাভ কতটুকু হচ্ছে! এদেশে শিক্ষার প্রতিকূল পরিবেশ হাতির চাইতেও বিশালাকার বলে আমার ধারণা। সামান্য চিমটি দিয়ে হাতিকে বশে আনা যেমন দুরাশা, তেমনি একটা লেখা দিয়ে নানামুখী পরিবেশকে অনুকূলে আনাটাও দিবাস্বপ্নের মতো। আবার এই অল্প পরিসরে সব কথা খোলা মন নিয়ে প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। শিক্ষার পরিবেশ অনেকগুলো ফ্যাক্টরকে সম্পৃক্ত করে। এর মধ্যে রাজনৈতিক পরিবেশ-প্রতিকূলতা সকল প্রতিকূলতার সূতিকাগার বলা যায়। যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবেশকে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনুকূলে আনা যায়, তাদের চৈতন্যোদয় হওয়ারও প্রশ্ন। অন্ধ হলে প্রলয় তো আর বন্ধ থাকে না। তাই যা হবার তাই হচ্ছে। দেশ থেকে শিক্ষা নিরুদ্দেশ হতে চলেছে। এদেশের যত দুর্নীতি, দুরাচারবৃত্তি, দুরবগ্রহ দুঃস্বপ্ন, দুঃশাসন সবকিছুই শিক্ষাহীনতার সামাজিক অভিঘাত। শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সততা, মানবিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, দেশপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণাবলী হারিয়ে যেতে বসেছে। শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার অভাবে সমাজ আজ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অশিষ্ট পরিবেশে রূপ নিয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক শিক্ষাহীনতার প্রভাব পুরো শিক্ষাব্যবস্থার উপর পড়ছে। বিপরীতক্রমে, শিক্ষার অভাবে আমরা এই দুর্বিনীত অভিঘাত-জর্জরিত সমাজের উত্তরাধিকার হয়েছি। এ সমাজ সমাজ-উন্নয়ন ও জাতিগত উৎকর্ষকে ক্রমশই পিছে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এ পরিবেশকে পারস্পরিক দুষ্টক্ষত বলা যায়। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসাটা অতীব জরুরি; যদিও তা অতটা সহজ নয়।

শিক্ষার উন্নতির জন্য সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিবেশ দুটোই সমানভাবে প্রয়োজন। সমাজে তো শুধু ছাত্রছাত্রীরাই বাস করে না, আপামর-সাধারণ সবাই বাস করে। তারাও সমাজ থেকে শিক্ষা নেয়। ছাত্রছাত্রীরাও পাঠ্যবই ছাড়াও সমাজ থেকে শিক্ষা নেয়। রাজনৈতিক চাল-চলন, নীতি-দুর্নীতি, সুকর্ম-দুষ্কর্ম প্রতিটার প্রভাব সমাজের উপর গিয়ে পড়ে। শিক্ষা তাই দিন দিন রুগ্নদশায় পরিণত হচ্ছে। এ রুগ্নদশার প্রভাব উদ্ঘাটনের জন্য গবেষণা করলেও শিক্ষাহীনতার কারণে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৈন্যদশার চিত্রই ফুটে উঠবে।

এদেশে রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাপনা মোটেই শিক্ষাবান্ধব নয়। এদেশের মূল সমস্যা হচ্ছে– রাজনীতি। রাজনীতি এদেশে জনসম্পদ গড়ার অন্তরায়। রাজনীতি এদেশের শিক্ষা, সমাজ, মানুষের মনুষ্যত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, মানুষের সুকুমার মনোবৃত্তি ক্রমশই নষ্ট করে দিচ্ছে। প্রতিদিনের পত্রিকাগুলোতে একটু চোখ বুলালে এসবই চোখে পরিষ্কার ধরা পড়ে। যে সরকারই যখন আসে শিক্ষা নিয়ে মহারাজনীতি শুরু করে দেয়। শিক্ষাঙ্গন নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষার্থী নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি, শিক্ষার উপকরণ নিয়ে রাজনীতি মহাসমারোহে চলতে থাকে। তাদের একটাই বুঝ, 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।' রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হয় উলু-খড়ের প্রাণ যায়। শিক্ষা বলে, আমি কোথায় পালাই! শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হলে জাতীয় অগ্রগতি ব্যহত হয়, দুর্নিবার দুর্গতি শুরু হয়। এক সরকার যায়, আরেক সরকার আসে। দেশ ও জনগোষ্ঠী ক্রমশ পিছতে থাকে। পরিণামে জাতি ধ্বংস হয়, একসময় অশিক্ষিত জাতি দেশকে

গিলে খায়। জাতি ধ্বংস হলে, সুযোগ্য রাজনীতিবিদরা কেউই দায়ভার নিতে চায় না, ফল ভোগ করে জনগোষ্ঠী– যুগ যুগ ধরে, কখনো শত শত বছর ধরে। যা বলছি, ইতিহাসের বাস্তবতা থেকেই বলছি। এতে কারো মুখ ভার করার প্রয়োজন নেই। আত্মপক্ষ সমর্থন করারও প্রয়োজন নেই। প্রতিপক্ষ না ভেবে, আক্রমণাত্মক কথা না বাড়িয়ে সমাধানের দিকে যাওয়াই সময়ের দাবি।

রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব সামাজিক পরিবেশকে অস্থির করে তুলছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো সমাজেরই একটা অংশ। সামাজিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার বহিঃপ্রকাশ শিক্ষা ও শিক্ষাঙ্গনের উপর গিয়ে বর্তাচ্ছে। যদি বলা হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি কি তাদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করছে? শিক্ষার্থীদের শিক্ষার কথা বিবেচনা করে ভালো মানের শিক্ষক কি নিয়োগ দিচ্ছে? স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজে শিক্ষার মান বাড়ে এমন কোনো কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে? না-কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উপলক্ষ করে দলবাজী, মারামারি, কুটিল বুদ্ধির চর্চা করছে, অর্থের গন্ধ শুকছে? তারা তো শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতির মাঠ বলে ভাবছে। দৈনিক পত্রিকার পাতাগুলোতে প্রতিদিন আমরা কী পড়ি? দৈনিক পত্রিকার খবরগুলোই আমাদের রিসার্স ফাইন্ডিংস হতে পারে। শিক্ষা দেওয়ার জন্য কি আমরা মেধাবীদেরকে খুঁজে নিচ্ছি? তাদের নিয়োগ নিয়েও কি আমরা রাজনীতি, নিয়োগ বাণিজ্য, উদগ্র পক্ষপাতিত্ব করছিনে?

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশেরও দৈন্যদশা। অনেক স্কুল-কলেজের প্রতিটা শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাধিক্য। স্কুল-কলেজের শ্রেণিকক্ষে বসিয়ে লেখাপড়াটা হয় না বললেই চলে। পড়ার জন্য বা পরীক্ষায় পাশের জন্য কোচিং-সেন্টার ও প্রাইভেট টিউশনিকে খুঁজে নিতে হয়। অনেক শিক্ষক আছেন স্কুল-কলেজের তুলনায় বাসায় বা কোচিং-সেন্টারে বসিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার তালিম দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। দিনে দিনে এটাও একটা সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। কেউ বলেন, শিক্ষকেরা শিক্ষা-ব্যবসা খুলেছেন। সাধারণ মানুষ ও স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটি নির্বিকার; 'চেয়ে চেয়ে দেখলাম, বলার কিছু ছিল না'। অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। এটাও সামাজিক শিক্ষার অংশ। তারা শিক্ষাঙ্গনের স্টেকহোল্ডার। সচেতন অভিভাবকদেরকে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা সম্মানের সাথে আদায় করে নিতে হবে। ক্লাস-শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং ছাত্রছাত্রীদের অকালেই ঝরে যাওয়া রোধকল্পে এর কোনো বিকল্প আপাতত নেই। ফুল-টাইম স্কুলিং হবে। প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুইবার টিফিনের ব্যবস্থা থাকবে, খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকবে। ক্লাসে শিক্ষক শেখাবেন, ছাত্রছাত্রী ক্লাসে বসেই পড়বে, চলমান পরীক্ষা ও ক্লাস-মূল্যায়ন হবে। বাড়িতে শুধু কিছু বাড়ির কাজ থাকবে। হাউজ টিউটর বলুন, টিউশনির ব্যবসা বলুন– সব আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে। বার বার সিলেবাস বদল করা সমিচীন নয়। কিছুটা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যেতে পারে। এদেশের শিক্ষায় সিলেবাস যথেষ্ট উন্নত। সিলেবাসের ব্যাপক পরিবর্তনের খেসারত ছাত্রছাত্রীদেরকে দিতে হয়। মূল সমস্যাটা হচ্ছে– পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে। পরিকল্পনা ও নির্দেশনার বাস্তবায়নে বিশাল আকারে সিস্টেম লস দেখা দেয়। সবক্ষেত্রে এটাই বাস্তবতা। 'ফাল্গুন রাতে দখিনা বায়ে কোথা দিশা খঁজে পাই না, যাহা চাই, ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।'

বর্তমানে অনেক এলাকার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার অঙ্গনে সরকারি টাকায় বড় বড় বিল্ডিং হতে দেখছি। দৃশ্যটা দেখতে ভালোই লাগে। বিল্ডিংয়ে বসে সুশিক্ষা কুশিক্ষা দুই-ই নেওয়া যায়। এদেশে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা তো নেহায়েত কম না, অগণন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিল্ডিংয়ের নামে নিরেট একগাদা ইটের

স্তুপ তো আর দেশ ও জাতির উপযোগী শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বা জনসম্পদ তৈরি করতে পারে না। প্রয়োজন হয় শিক্ষা-উপযোগী পরিবেশের; সে-সাথে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা। এদেশে এগুলোর বড্ড অভাব। সংশ্লিষ্ট পক্ষের সদিচ্ছা শিক্ষার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। বাস্তবতা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মুখে বলে এক, কাজ করে ভিন্ন। 'মাকালের ফল দেখতে ভালো, উপরে লাল ভিতরে কালো' অবস্থা।

মাত্র কয়েক বছর আগে থেকে পঞ্চম শ্রেণি ও অষ্টম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন সেটা আবার উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কী পেয়েছি, কী হারিয়েছি– যোগ-বিয়োগ এখন অনর্থক। সে-সাথে এসএসসি পরীক্ষার সিলেবাসে মানবিক-ব্যবসায়-বিজ্ঞান গ্রুপকে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে শুনেছি। এসব পরিবর্তনে শিক্ষাব্যবস্থার শনৈঃ-শনৈঃ উন্নতি হয়ে যাবে, গুণগত শিক্ষা বৃদ্ধি পাবে, লেখা ও পড়া জানা লোক সব শিক্ষিত হয়ে যাবে– এমনটি ভেবে আত্মপ্রসাদ গনার কোনো অবকাশ নেই। এতে শিক্ষার অবস্থা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে; সরকার ও অভিভাবকমহলের পকেট থেকে কিছু কম টাকা ব্যয় হবে, এটুকুই আশা। বরং অবকাশ আছে, যে যে কারণে পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় ধস নেমেছে, তা খতিয়ে বের করা, প্রতিবিধানের উপায় বের করা। উপায়গুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা। এসএসসি পর্যায়ের সকল কোর্স একবারে চাবি মেরে সুনির্দিষ্ট করে না দিয়ে কিছু কোর্স ঐচ্ছিক রাখা যেতে পারতো। এতে এ পর্যায়ের শিক্ষায় নমনীয়তা বাড়তো। এভাবে সপ্তম ও অষ্টম শেণির সিলেবাসেও নমনীয়তা আনার ব্যবস্থা রাখা ভালো। এসএসসি পর্যায়ের ১২০০ নম্বরের পরীক্ষা একবারে দশম শ্রেণি শেষে না নিয়ে, দুই ভাগ করে নবম শ্রেণি শেষে একবার ৬০০ নম্বর এবং বাকিটা দশম শ্রেণি শেষে নিলে অধিক ভালো হতো। এতে ছাত্রছাত্রীরাই বেশি লাভবান হতো। ছাত্রছাত্রীদেরকে দু'বছর শেষে একবার পরীক্ষার কাজে ব্যস্ত না রেখে অনেকগুলো কোর্সের পড়াশোনার বাধ্যবাধকতাকে দু'বছরব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া যেত। তাতে পরীক্ষার ফলাফলও ভালো হতো। পাবলিক পরীক্ষার নম্বর বেশি বেশি স্কুল-মাদ্রাসার হাতে না ছেড়ে দেওয়াই ভালো। এতে পরীক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। পরিবর্তনের পুরো বিষয়গুলো নিয়েই 'সেকেন্ড থট' দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে।

এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার মান উন্নত করতে গেলে অনেক বিষয়েই পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নেওয়া লাগবে। একজন শিক্ষিত লোক কি কি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হবে– তা আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার, যাকে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য বলি। প্রতিটা মানুষের একটা জীবন আছে ও সে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে, জীবন পরিচালনা করতে হয়, জীবন ও সমাজের ভালো-মন্দ বোধ তার মধ্যে জন্মাতে হয়, ভালোর জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়– তাই শিক্ষা হতে হবে জীবনমুখী। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কর্ম করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, কর্মের মাধ্যমে স্বপ্ন পূরণ করতে হয়– তাই শিক্ষা হতে হবে কর্মমুখী। এদেশে কর্মমুখী শিক্ষার ভিত গড়তে গেলে টেকনিক্যাল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা– দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। টেকনিক্যাল শিক্ষার পুরোটাই ব্যবহারিক শিক্ষামুখী হওয়া দরকার। উচ্চশিক্ষায়ও প্রায়োগিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোল্যাবরেশন বাড়াতে হবে। প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষায় গুরুত্বারোপ করতে হবে। অক্ষয় কুমার বড়াল বলেছিলেন, 'কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্তি নয়, ধরণী চাহিছে শুধু হৃদয়, হৃদয়'। মানুষ হয়ে মানুষের মতো বাঁচতে মানুষের আগে প্রয়োজন 'হৃদয়', অর্থাৎ মন-মানসিকতা। প্রয়োজন মানুষের হৃদয়ে দেশ-মাটি-মাতৃকার জন্য ভালোবাসা, সমাজের মানুষের জন্য দায়বদ্ধতা, মানবতার গুণাবলী যেমন– ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা, অহিংস মনোভাব, বিবেকবোধ, ন্যায়নিষ্ঠার মতো মানবিক গুণ। এগুলো সুশিক্ষার মাধ্যমে জাগিয়ে তুলতে হয়, নইলে মানুষ আর মানুষ থাকে না– তাই শিক্ষা হতে

হবে মানবিক গুণাবলী-উদ্রেককারী। শিক্ষার্থীর হৃদয়ের গহীন কন্দরে মানবিক এ গুণগুলোকে ঢুকিয়ে দিতে হবে, শিক্ষা মুখস্থ করালে চলবে না। শিক্ষার মাধ্যমে এসব মানবিক গুণের বিকাশ যার হৃদয়ে যতটা প্রস্ফুটিত হবে, তাকে তত শিক্ষিত বলতে হবে। একমাত্র সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ ও যোগ্য শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা পারে এই ভিত্তিমূলগুলোকে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রথিত করতে।

উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপকরণের যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগ প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন সুষ্ঠু ও বিশদ পরিকল্পনা। আমরা সব সময় খাজনার তুলনায় বাজনা বেশি করে ফেলি– সেদিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নযোগ্য হওয়া দরকার। উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন অনেকটা সহজ বলতে হবে। যত অসুবিধা বাস্তবায়ন নিয়ে। এদেশের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা যে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বড় বাধা। তখনই রাজনৈতিক দলগুলোর অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। মুখে সবাই বলে মেনে চলবো, কিন্তু বাস্তবে মানে না। তবু দেশ ও জাতির স্বার্থে শিক্ষার এ উদ্দেশ্য ও তার বাস্তবায়ন করতেই হবে। এ বিষয়টিকে সরকারের আন্তরিকতার সাথে নিতেই হবে। এদেশের শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সুশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ দলমত নির্বিশেষে পাশে থাকবেন। বাস্তবায়নে অসুবিধা হলে প্রতিটি ব্যবস্থারই বিকল্প ব্যবস্থা থাকে– বাস্তবায়নের জন্য ভিন্ন পথের কথাও ভাবা যেতে পারে; বারান্তরে বলা যাবে। উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন কতখানি হচ্ছে, তা দেখার জন্য তিন বছর পরেই একটা মূল্যায়ন গবেষণা করতে হবে। অর্জনের পথে বাধা-বিঘ্ন, জঞ্জাল অবশ্যই অপসারণ করে ফেলতে হবে। এ যে দেশ ও জাতির অস্তিত্ব টিকে থাকার প্রশ্ন।

(৩০ আগষ্ট '২২, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক